ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

বর্ধিত সারসংক্ষেপ

১৭ ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগামা ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি
মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি
মোহাম্মদ নূরে আলম মিল্টন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটিসহ বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরনো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ডিসেম্বর ২০১৯ হতে চীনের উহান থেকে করোনা ভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ শৃংঙ্খল) ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত অন্যতম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০% কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে জানুয়ারি ২০২০ হতে এ খাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে লকডাউন ঘোষণা করে। ফলশ্রুতিতে ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ চলমান ক্রয়াদেশ স্থগিত বা বাতিল করে। এপ্রিল মাসে পোশাক রপ্তানি ৭৭.৬৭% কমে যায় যা জুন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়কালে ৪১৮টি কারখানা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় সংশিষ্ট কারখানাসমূহের শ্রমিকরা কাজ হারায়। দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওপর রপ্তানি বাণিজ্যের অধিক নির্ভরশীলতা (প্রায় ৮৪%) এবং মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নজিরবিহীন এই সংকোচনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জানুয়ারি - জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-২৪.৬৮%) হয়। কার্যাদেশ বাতিল, মালিক পক্ষের আর্থিক সক্ষমতা না থাকার যুক্তি এবং কারখানা বন্ধের কারণে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তাছাড়া সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি উপেক্ষা করে কারখানা মালিকপক্ষ কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকরা চলে আসে। পরবর্তিতে সমালোচনার মুখে একই দিনে কারখানা বন্ধের ঘোষণা করায় কারখানা শ্রমিকরা পূনরায় নিজ এলকায় ফিরে যায়। ফলে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১: ২০১৫-'১৬ থেকে ২০১৯-'২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমান (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

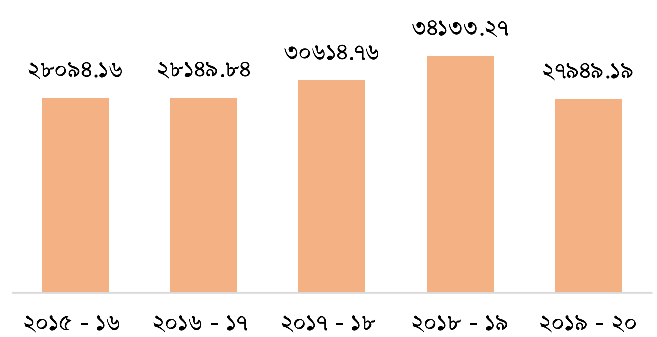

বাংলাদেশের পোশাক খাতের চলমান এসব ঝুঁকি নিরসনে সরকার, ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা মহামারির সময়কালে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং সরকার ও মালিকপক্ষ (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিবেদনে চুক্তিভঙ্গ করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল, চলমান মহামারিকালে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা প্রদান না করা, লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক ছাঁটাই, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না করা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়ানোর অবস্থায় সমগ্র বিশ্বে করোনা সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় উপরোক্ত ঝুঁকিসমূহ অধিকহারে দেখা দেবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

টিআইবি রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারবাহিকতায় করোনা সংকটের সময়ে এই খাতে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান ছিল বা এখনো অব্যাহতভাবে রয়েছে। এবং কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তা নিরূপণ করা এই খাতে সংকট মোকাবেলায় একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্যে অত্যন্ত জরুরী।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো: (১) বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক করোনা সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা; এবং (২) করোনা উদ্ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে অংশীজনদের করণীয় চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), শ্রম অধিদপ্তর, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, নীতি, দাপ্তরিক নথি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণা কর্মটি মে - নভেম্বর ২০২০ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪ তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের ছয়টি (৬টি) সুর্নিদিষ্ট নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট উপ-নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভূক্ত নির্দেশকসমূহ হলো- আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, সাড়া প্রদান, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা।

সারণি-১: গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশক এবং উপ-নির্দেশক সমূহ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক
আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ
সাড়া প্রদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আর্থিক সহায়তা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা	মজুরি ও ভাতা, চাকুরি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা
জবাবদিহিতা	কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থা

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬: ধারা ১৬(১) এ লে-অফ ঘোষণা করা কারখানায় এক বছরের কম কাজ করা শ্রমিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা এবং ৪৫ দিনের বেশি লে-অফ হলে ধারা ২০ এর অধীন ছাঁটাই করার বিধান থাকায় মালিকপক্ষ একতরফা সুবিধা ভোগ করে। করোনা মহামারিকালে এর ফলে মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চিতে কারখানা লে-অফ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন শ্রমিকরা। উল্লেখিত দুটি ধারার কারণে করোনা সংকটকালেও একবছরের কম সময় কাজ করা প্রায় ২০% তৈরি পোশাক শ্রমিক কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পায় নি। তাছাড়া ধারা ২০ এর ২(ক) অনুযায়ী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে একমাসের অগ্রিম নোটিস প্রদান করতে হবে। কোনো কারণে নোটিস দিতে ব্যর্থ হলে একমাসের বেতন প্রদান করার বিধান থাকলেও করোনা মহামারিকালে অধিকাংশক্ষেত্রে এ ধারা লঙ্ঘন করে শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২: সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও কারখানার ক্ষেত্রে তা কিভাবে প্রতিপালিত হবে স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে করোনা উদ্ভূত সংকটে মালিক কর্তৃক একতরফাভাবে কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং শ্রমিকদের অধিকার উপেক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য, লকডাউন ঘোষণার ক্ষেত্রে ভারতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং পাকিস্তানে মহামারি রোগ

সংক্রান্ত আইন, ২০১৪ এর প্রয়োগ করা হয়েছে। উক্ত আইন প্রয়োগ করে দেশ দুটির সরকার কারখানা লে-অফ করতে পারবে না এমন স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬ এপ্রিল সংক্রমাক রোগ (প্রতিরোধ আইন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ধারা ১১(১) ক্ষমতাবলে জনগণকে বাইরে বের হতে নিষেধ করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এক্ষেত্রে কী করণীয় সে সম্পর্কে শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পূরক কোনো নির্দেশনা জারি করে নি। এর ফলে কারখানা মালিক কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে আসা এবং সমালোচনার কারণে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে সংক্রমণ বৃদ্ধিও অধিক ঝুঁকি সুষ্টি হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

২.২ সাড়া প্রদান

২.২.১ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনা সংকট মোকাবেলায় তৈরি পোশাক খাতে কোনো পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয় নি। সরকার করোনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিকদেরকে উপেক্ষা করে মূলত মালিকপক্ষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। তাছাড়া এ খাতের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক করোনা মহামারির কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাক ব্যবসার একটি বড় অংশ বাংলাদেশে চলে আসবে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগার উদাহরণ রয়েছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকারের কাছে সম্ভাব্য করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফেব্রুয়ারি মাসে তিনটি দাবি উত্থাপন করে। এগুলো হলো-(১) ব্যয় সংকোচনের জন্য আপদকালীন তহবিল গঠন; (২) 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসি নীতিমালায় সংশোধন; এবং (৩) ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক উত্থাপিত এসব দাবির প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির নীতিমালায় রপ্তানি বিল দেশে আনার সময়সীমা দুই মাস বাড়িয়ে ছয় মাস নির্ধারণ এবং আপদকালীন তহবিল গঠন ও ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা প্রদান অন্যতম।

এপ্রিল-মে পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বাতিলকৃত ক্রয়াদেশ পুনর্বহাল ও নতুন কার্যাদেশের জন্য কৌশল প্রণয়ন করে। সরকারের এই উদ্যোগের কারণে নেদারল্যান্ড ও সুইডেন সরকার ক্রয়াদেশ বাতিল না করার অঙ্গীকার করে এবং বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশ বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের একাংশ পুনর্বহালের অঙ্গীকার করে। ফলশ্রুতিতে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের মধ্যে ৯০% পুনর্বহাল হয় এবং প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের নতুন কার্যাদেশ বাংলাদেশে এসেছে। তবে সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নানা উদ্যোগের পরেও অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ (প্রায় ৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২,৬৯৩ কোটি টাকা) বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের উৎপাদিত পণ্য কারখানার মালিক শিপমেন্ট করতে পারে নি। অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে বলে মালিকপক্ষের অভিযোগ রয়েছে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চলমান ও নতুন কার্যাদেশে পণ্যের ৫%-১৫% মূল্য ছাড় এবং অর্থ পরিশোধের জন্য ৯০-১৮০ দিন সময় দাবি করা হয়। ফলে সরবরাহকারী দেশী তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও ব্যবসা পরিচালনায় সংকটে পড়ে, পোশাক শিল্পে নগদ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

২.২.২ প্রণোদনা

রপ্তানি প্রণোদনা ও কর অব্যাহতি: সরকার কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিভিন্ন সুবিধা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রপ্তানি প্রণোদনার জন্য ২,৮৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ; নতুন বাজারের জন্য চলমান ৫% প্রণোদনা অব্যাহত রাখা; এবং কর হার পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১০% - ১২% অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। তাছাড়া তৈরি পোশাক খাতে কাঁচামাল আমদানিতে কর হ্রাস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এ খাতের কাঁচামাল আমদানির ওপর আগাম কর ৫% থেকে কমিয়ে ৪% নির্ধারণ এবং তুলা ও অগ্নি প্রতিরোধ যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়। উৎপাদন পর্যায়ে সুতা উৎপাদনে কর হার হ্রাস এবং পিপিই ও মাস্ক উৎপাদনে কর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের মজুরি-ভাতা প্রদানে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা: সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য মোট ১০,৫০০ কোটি টাকার স্বল্প সুদে ঋণ 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করে। শ্রমিকদের মজুরি-ভাতা প্রদানের এই আর্থিক প্রণোদনা সরকারি ও বেসরকারি ৪৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে বিজিএমইএ'র ১,৩৭০টি এবং বিকেএমইএর ৪২০টি কারখানাসহ মোট ২,০৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। প্রণোদনার অর্থ শ্রমিকদের সরাসরি দেওয়ার লক্ষ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর

মাধ্যমে নিজস্ব মোবাইল অ্যাকাউন্টে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে তৈরি পোশাক খাতের ঋণের পরিমাণ ৩৫০ থেকে ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ এবং সুদের হার কমানো হয়।

মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ: সরকার কর্তৃক কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় এবং তা ৩১ আগস্টের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (পোশাক খাতের প্রায় ১,৫০০টি) জন্য বরাদ্দকৃত ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৯% বিতরণ করা হয় এবং বৃহৎ শিল্পের (যার মধ্যে পোশাক খাতের কারখানা প্রায় ৩,০০০টি) জন্য বরাদ্দকৃত মোট ৩৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৮৫% বিতরণ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, দেশ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা: বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের করোনা মহামারির সংকট মোকাবেলায় কয়েকটি তহবিল গঠন করে। তন্মধ্যে জার্মানী, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), এফসিডিও, ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন (ইইউ), এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন, লেভিস্ট্রস এবং টেক্স-এ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম।

প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা বিতরণ ও বাস্তবতা: করোনা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতকে দেওয়া বিভিন্ন অংশীজনের প্রণোদনা ও সহায়তা বিশ্লেষণে দেখা যায় - মোট প্রণোদনার ৯৮.৫৭% (প্রায় ৬১,৯৮০ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেওয়া হয় মোট প্রণোদনার ১.৪০% (প্রায় ৮৭৫ কোটি টাকা) এবং বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০.০৩% (প্রায় ১৯.৭১ কোটি টাকা)। সরকার কর্তৃক প্রদেয় মোট প্রণোদনার ৯৫.৩৪% (প্রায় ৫৯,০৯০ কোটি টাকা) ভর্তুকি সুদে ঋণ সহায়তা প্যাকেজের আওতায় দেওয়া হয়।

সারণি ২: এক নজরে তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনার পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

প্রণোদনা/ সহায়তার ধরন	প্রণোদনা/সহায়তা	প্রণোদনা/সহায়তার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
ঋণ সহায়তা	এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য ঋণ সহায়তা প্যাকেজ	৯,১৮৮.০০*	৫৯,০৯০.০০
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ঋণের পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীতকরণ	১০,৮২২.০০**	
	বৃহৎ শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ	৩৪,৮০০.০০*	
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ	৪,২৮০.০০***	
আর্থিক সহায়তা	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা	৮৭৫.০০	৩,৭৮৯.৭১
	এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন নারী পোশাক শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা	১১.০০	
	লেভিস্ট্রস সংশ্লিষ্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা	৮.৫০	
	'টেক্স-এ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল' কর্তৃক শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা সহায়তা	০.২১	
	রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা ১% বৃদ্ধি	২,৮৯৫.০০	
মোট		**৬২,৮৭৯.৭১**	**৬২,৮৭৯.৭১**

* দেশের মোট বৃহৎ শিল্পের ৮৭.৫০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;
** দেশের মোট রপ্তানির ৮৫.২৭% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;
*** দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ২১.৪০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারি ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রণোদনার বেশিরভাগ কারখানা মালিকদের ব্যবসায়িক সংকট মোকাবেলায় দেওয়া হয়। করোনা সংকট মোকাবেলায় প্রদেয় প্রণোদনার প্রায় ৮৪% বা ৫২,৮০০ কোটি টাকা দেওয়া হয় তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। কিন্তু এপ্রিল-জুলাই পর্যন্ত তৈরি পোশাক শ্রমিকদের প্রাক্কলিত বেতন-ভাতা প্রায় ১২,৬৯২[১] কোটি টাকা হলেও সরকার প্রদেয় এই প্যাকেজে প্রণোদনার পরিমান ছিল ৯,১৮৮ কোটি টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় ২৭.৬% কম। ফলশ্রুতিতে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের প্রায় ৪২.০২%[২] (প্রায় ১৪ লক্ষ) বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি প্রণোদনার অর্থ পায়নি বা বঞ্চিত হয়।

ইইউ ও জার্মানি কর্তৃক পোশাক শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার তহবিল (শ্রমিক কল্যাণে আন্তর্জাতিক সহায়তার ৯৭.৭৯% বা ৮৭৫ কোটি টাকা) গঠনের প্রায় তিন মাস পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গবেষণার তথ্যানুযায়ী এক্ষেত্রে

[১] তৈরি পোশাক শ্রমিক প্রতি মাসিক ১১৩ মার্কিন ডলার হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।
[২] তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সরকার ও মালিকপক্ষের সংগঠনসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নে অনাগ্রহ ও দায়িত্বে অবহেলা ছিল। ফলশ্রুতিতে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা এখনো পায় নি। তালিকা তৈরির পদ্ধতিগত জটিলতা থাকার কারণে তৈরি পোশাক খাতের মালিক সংগঠনসমূহের (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) বাইরে থাকা কারখানা ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

চিত্র ২: প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%) ও পরিমাণ (কোটি টাকায়)

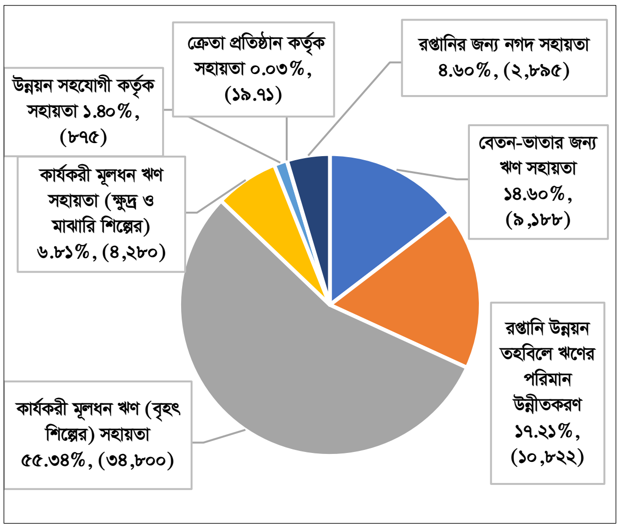

চিত্র ৩: শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%)

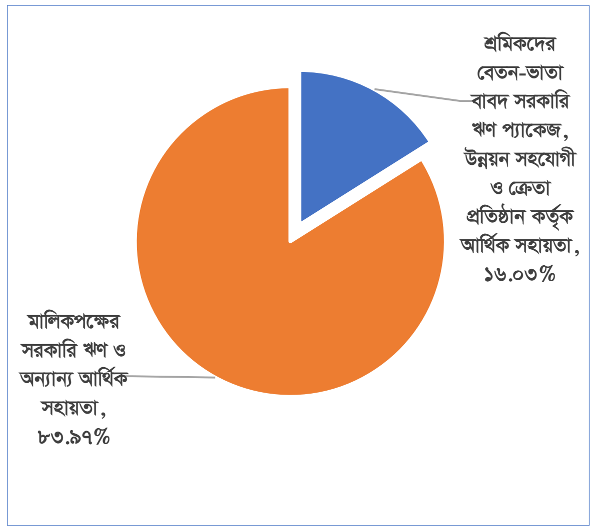

প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে বড় কারখানাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে প্রণোদনা প্রাপ্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও তদবিরের অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া ব্যাংক হতে অর্থ ছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য কারখানাসমূহের অর্থ প্রাপ্তিতে এক মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়। ফলে শ্রমিকরা যথাসময়ে বেতন-ভাতা পায় নি এবং করোনা সংকটকালে মানবেতর অবস্থায় পতিত হয়। তাছাড়া এমএফএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন উত্তোলনে সময় ও অর্থ তুলনামূলক বেশি ব্যয় হওয়ায় এ পদ্ধতি ব্যবহারে শ্রমিকরা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। কিছু কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং করোনা সংকটের শুরুতে ছাঁটাই হওয়ার কারণে প্রণোদনা প্রাপ্ত ৬৪ কারখানার ২১ হাজার শ্রমিকের বেতন-ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহের জন্য কোনো নির্দেশনা না থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কারখানার প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিকের বেতন-ভাতা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

প্রণোদনা বিতরণেও বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। ঋণের টাকা পরিশোধে বৃহৎ শিল্প খাতের জন্য দুই বছর নির্ধারণ করলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য তা এক বছর নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে অনাগ্রহ প্রকাশের অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য গঠিত প্রণোদনা তহবিল ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। অপরদিকে নতুন অর্থবছরে (২০২০-২১ অর্থবছর) পোশাক খাতের জন্য উৎস কর পূর্বের ০.২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ০.৫০% নির্ধারণ করার ফলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২.২.৩ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ

মার্চ ২০২০ এ করোনা মহামারির শুরুতে সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকার বা মালিকপক্ষের কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষই কলকারখানা বন্ধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। তথ্যানুযায়ী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৪ মার্চ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২৭ মার্চ কারখানা খোলা রাখা যাবে এমন প্রজ্ঞাপন জারি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সাথে সমন্বয় করে ২৬ মার্চ ও ৫ এপ্রিল কারখানা বন্ধের আহ্বান করে। সরকার ১ এপ্রিল সাধারণ ছুটি বর্ধিত করলেও কারখানা মালিকগণ অপরিকল্পিতভাবে কারখানা খুলে দেয়। কারখানা খোলার খবরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৈরি পোশাক শ্রমিকরা কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় চলে আসে, এবং একই দিনে কারখানা বন্ধ ঘোষণায় পুনরায় ফেরত যেতে বাধ্য হয়। এতে করে পরিবহণ সংকটে শ্রমিকদের হয়রানির শিকার হতে হয় এবং সারাদেশে ব্যাপকভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

২.২.৪ প্রশিক্ষণ

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কোভিড-১৯ মহামারি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারখানার পার্টিসিপেশন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারখানা মালিকদের নির্দেশনা প্রদান করে। তাছাড়া বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-র সহায়তায় আইএলও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কারখানা সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য 'লার্নিং হাব' প্রকল্প চালু করে। আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত লার্নিং হাব প্রকল্পের অধীন মোট ১৫০ জন শ্রমিককে কারখানার সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা তৈরি পোশাক খাতের মোট শ্রমিকের সংখ্যা বিবেচনায় অতি নগণ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নি। তাছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে এবং কারখানা মালিকদের আগ্রহ ও সচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান।

২.৩ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে তৈরি পোশাক কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে সরকার, বিজিএমইএ ও কারখানা মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে এর মধ্যে অঞ্চলভেদে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কারখানা খোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে মালিকপক্ষ কোনো আলোচনা/সভা করে নি। এক্ষেত্রে সরকার, বিজিএমইএ, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষনীয়। অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার পরিবর্তে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনা না করে বিশৃঙ্খলভাবে সারাদেশে কারখানা খোলা হয়।

করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য জুন মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ'র কার্যালয়ে 'কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করা হয়। একই সময়ে কারখানাসমূহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রতিপালন অবস্থা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে - স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে কমিটি করা হলেও মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী কারখানা খোলা ও বন্ধের বিষয়ে তাঁকে জানানো হয় নি। তাছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তৈরি পোশাক কারখানা পরীবিক্ষণ কমিটিসমূহে শ্রমিক প্রতিনিধি না রাখার ফলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় নি। অনুরূপভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সংযুক্ত না করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একক সিদ্ধান্তে কমিটি গঠনের ফলে কমিটিসমূহ কার্যকরভাবে পরিদর্শন করতে পারে নি।

২.৪ স্বচ্ছতা

এপ্রিল ২০২০ এ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কারখানার শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ২৩টি কার্যালয়ে রেজিস্টার চালু করে। একই সময়ে শিল্প পুলিশ কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে পূর্বের মতো করোনা সংকটকালেও এই খাত বিষয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে কলকারখানার ধরন অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার পরিমাণ এবং প্রণোদনা বা সহায়তাপ্রাপ্ত কারখানা ও শ্রমিকের তালিকা সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হয় নি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টার চালু করা হলেও করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর হালনাগাদ কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় নি। জুলাই মাস পর্যন্ত শিল্প পুলিশ কর্তৃক করোনা সংক্রমিত কারখানা ও শ্রমিকের তথ্য প্রকাশ করা হলেও পরবর্তিতে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে আগষ্ট মাস থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করা থেকে শিল্প পুলিশ বিরত থাকে।

করোনা মহামারির ফলে উদ্ভূত সংকটের শুরুতে বিজিএমইএ কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিলের পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় বিজিএমইএ-প্রকাশিত তালিকায় শ্রমিক ছাঁটাই ও করোনা আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা কম দেখানো হয়। তাছাড়া বাতিল হওয়া প্রায় ৯০% কার্যাদেশ পুনর্বহাল হলেও বিজিএমইএ সে বিষয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বিরত থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার কনসোর্টিয়ামে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাতিলকৃত ও পুনর্বহালকৃত কার্যাদেশের আর্থিক পরিমাণ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে। তবে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্যে বাতিলকৃত কার্যাদেশের পরিমাণ কম দেখানো হয়।

২.৫ শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা

২.৫.১ বকেয়া মজুরি-ভাতা

এপ্রিল মাসে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি-ভাতা বিষয়ে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় সাধারণ ছুটিকালীন শ্রমিকদের বেতনের ৬৫% প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী লে-অফকৃত কারখানার ৫০% মজুরি প্রদানের বিধান থাকলেও কারখানাসমূহের মালিক কর্তৃক অধিক হারে (অর্থ্যাৎ ৬৫%) মজুরি প্রদানের অঙ্গিকার করা হয়। তাছাড়া ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে ঈদের পূর্বে অর্ধেক এবং পরবর্তী ছয় মাসে বেতনের সাথে বাকি অর্ধেক প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সরকার, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক মে মাস হতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিয়মিত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গৃহীত সব পদক্ষেপে বাস্তবায়নে অনেকক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ্য করা গেছে। অনেকক্ষেত্রে লে-অফ কারখানাসমূহে শ্রমিকদের মজুরি ও ঈদ বোনাস অঙ্গিকার অনুযায়ী (৬৫%) প্রদান করা হয় নি। তাছাড়া মে মাস হতে শ্রমিকদের মজুরি নিয়মিত প্রদানের বিজিএমইএ কর্তৃক নির্দেশনা থাকলেও অনেকক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি দেওয়া হয় নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মঘন্টার প্রাপ্য মজুরি ও ভাতা প্রদান করা হয় নি। ফলে করোনা উদ্ভুত সংকটে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, করোনা সংকটকালে ৭৭% শ্রমিক তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না (ব্র্যাক, ২০২০)। অপর একটি গবেষণায় করোনা সংকটের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মার্চ-মে পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরি ও ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে 'ওয়েজ গ্যাপ'* প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ৩০% ও ৪০% (ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন, ২০২০)।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, এপ্রিল মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানা লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক সংগঠন ও মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় এবং বিজিএমইএ কর্তৃক কারখানার মালিকদেরকে শ্রমিক ছাঁটাই না করে বকেয়া মজুরি কম অংশ প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। বিশেষ কারণে কারখানা মালিক কর্তৃক শ্রমিক ছাইয়ের ক্ষেত্রে দুই মাসের বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশনাও প্রদান করা হয়। তবে বাস্তবে দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই তা প্রতিপালন করা হয় নি। তথ্যানুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিজিএমইএ'র ৩৪৮টিসহ মোট ১,৯০৪টি কারখানা লে-অফ ও বন্ধ ঘোষণা করে এবং প্রায় ৬০-৬৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে একত্রে বহু সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করা হলেও পরবর্তীতে অল্প সংখ্যক নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে। কারখানাসমূহে ইচ্ছাকৃত ছাঁটাই আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কম বেতন ও মজুরি ছাড়া অতিরিক্ত কর্মঘন্টায় কাজ করানো এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে।

২.৫.২ স্বাস্থ্য সুরক্ষা

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিজিএমইএ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় তৈরি পোশাক কারখানার জন্য একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এছাড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর টেলিমেডিসিন সেবা এবং করোনা মহামারি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চারটি অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করেছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত এসব পদক্ষেপগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ্যনীয়। অনেকক্ষেত্রে কারখানা পরিচালনায় বিজিএমইএ'র গাইডলাইন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় নি। তথ্যানুযায়ী, অধিকাংশ কারখানায় মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হলেও হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই; শ্রমিকদের খাবার ও বিশ্রামের জায়গা এবং টয়লেটের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়নি। তাছাড়া শিফটিং পদ্ধতিতে ৩০%-৫০% শ্রমিকের মাধ্যমে কারখানা চালুর নির্দেশনা অধিকাংশ কারখানা মালিক মানে নি।

পোশাক শ্রমিকদের করোনা চিকিৎসায় বিজিএমইএ'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৫০ শয্যার একটি কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়। এপ্রিল মাসে বিজিএমইএ কর্তৃক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার জন্য ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে চারটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন এবং এসব ল্যাবে প্রতিদিন প্রতিদিন ১৮০টি নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে ঘোষিত চারটির স্থলে গাজীপুরে শুধু একটি পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয় এবং এই ল্যাবে দৈনিক ৪০-৫০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্থাপিত ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ এবং ল্যাব পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নমুনার পরীক্ষার ফলাফল পেতে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সময় লাগার অভিযোগ রয়েছে। ফলে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না এবং চাকুরি হারানোর আতঙ্কে উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্তৃক তা লুকানোর প্রবণতার কারণে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ খাতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৫.৭% পোশাক শ্রমিক (প্রাক্কলিত প্রায় ২৮.২৮ লাখ) ৫-৭ দিন করোনার লক্ষণে (ঠান্ডা, কফ ও জ্বর) ভুগেছেন বলে জানান - যদিও তাদের নগণ্যসংখ্যক করোনা পরীক্ষা করেছেন (ব্র্যাক, ২০২০)।

মালিকদের খরচে অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে পাঠানো এবং কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থায় অথবা পার্শ্ববর্তী বেসরকারি হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করার জন্য বিজিএমইএ নির্দেশনা প্রদান করে। একই সময়ে কর্মরত শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হলে মজুরিসহ সাধারণ ছুটি প্রদান এবং যাবতীয় চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কারখানা মালিকদের অনুরোধ করা হয়। বিজিএমইএ কর্তৃক দেওয়া এসব নির্দেশনা কারখানা মালিকরা অধিকাংশক্ষেত্রে পালন করে নি। তথ্যানুযায়ী, অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানার মালিক কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করে নি। কিছুক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা শ্রমিকদের সাধারণ ছুটি দেওয়ার পরিবর্তে ছাঁটাই করা এবং কোনো কোনো কারখানায় আক্রান্ত শ্রমিককে সাধারণ ছুটি দিলেও মজুরিসহ ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানায় ৫১১ জন শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং মোট ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে।

২.৫.৩ মাতৃত্বকালীন সুবিধা

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-র কারখানাসমূহে 'দ্যা ল্যাকটেটিং মাদার এইড ফান্ড প্রজেক্ট' চালু করা হয়। জুন মাসে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বিকেএমই এর কারখানাসমূহে 'নিউট্রিশন অফ ওয়ার্কিং ওমেন' প্রকল্প চালু করা হয়। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানা মালিক কর্তৃক করোনার কারণে মাতৃস্তন্যপানকারী শিশুদের কর্মস্থলে আনা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফলে স্তন্যদায়ী মায়েদের মানসিক অবসাদে ভোগা, সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া এবং উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে (ব্র্যাক, ২০২০)। কিছুক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান না করা ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা ও কাজে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

২.৫.৪ সংগঠনের অধিকার

করোনা মহামারির সময়ে সরকার কর্তৃক শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন বন্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহ করোনা মহামরিকালীন শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় মালিকপক্ষ ও সরকারের সাথে বিভিন্ন সভা আয়োজন করেছে এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ও পূর্ণাঙ্গ মজুরি-ভাতা পাওয়ার জন্য ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ আয়োজন করেছে। তথ্যানুযায়ী, কার্যাদেশ না থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন অধিকাংশ ক্ষুদ্র কারখানা ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি উপেক্ষিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। তবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলো করোনা মহামারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যাদেশ বাতিল না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

২.৬ জবাবদিহিতা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কারখানার জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ২৬টি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করা হয়। এসব কমিটি ঢাকার অভ্যন্তরের মাত্র ৫টি কারখানা পরিদর্শন করে। প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সুরক্ষা সমগ্রীর ঘাটতির কারণে এসব কমিটি অধিকাংশ কারখানা পরিদর্শন করতে পারে নি। ফলে কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় নি। কোভিড-১৯ মহামারিকালে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ১০০ অধিক স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। কারখানা পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ কার্যালয়ে কারখানা পর্যায়ের যেকোনো অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন চালু করা হয়। কিন্তু কারখানা পর্যায়ে হটলাইন বিষয়ে প্রচারণার ঘাটতি এবং নির্ধারিত নম্বরে ফোন দিয়ে কাউকে না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

কার্যাদেশে উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ বা কার্যাদেশ বাতিল করা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্যের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম পর্যায়ে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে মালিকপক্ষের নেওয়া এই উদ্যোগটি শুরুতেই সমস্যার সম্মুখিন হয় - মাস্টার এলসির পরিবর্তে শুধু কার্যাদেশনির্ভর বাণিজ্য সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেকক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয় নি। ফলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাপে গৃহীত কালো তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম থেকেও মালিক সংগঠনকে সরে আসতে বাধ্য করা হয়। অনুরূপভাবে লে-অফকৃত কারখানাসমূহ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পাবে না-বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে এমন নির্দেশনা প্রদান করলেও পরে মালিকপক্ষের প্রভাব ও চাপে এই নির্দেশনা থেকে সরে আসে।

পরিস্থিতি নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজিএমইএ এলাকা-ভিত্তিক চারটি 'জোনাল কমিটি' এবং পরিচালকদের নেতৃত্বে ছয়টি নিরীক্ষা দল গঠন করে। গঠিত নিরীক্ষা দল মোট ১৪৭টি কারখানা পরিদর্শন করে এবং তিনটি কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করার পরামর্শ প্রদান করে। তবে প্রথম পর্যায়ে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করলেও বর্তমানে তা ঝিমিয়ে পড়েছে।

৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিভিন্ন সময়ে উঠে আসলেও তা নিরসণে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষনীয় - করোনার সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে;
- চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল; মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে - করোনার মতো সংকট মোকাবিলায় এ খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয় নি
- মালিকপক্ষ ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করে নি
- করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে বরং কারখানা মালিকদের চাপ প্রদান ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে
- করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা লক্ষনীয়
- সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়; সংকট হতে উত্তরণের জন্য এ খাতে সরকার কর্তৃক বিপুল প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করে যার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকরা পেয়েছে

৩.২ সুপারিশ

১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬' এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করতে হবে

২. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালন ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে

৩. বিজিএমইএ'র অঙ্গীকার করা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার বাকি তিনটি ল্যাব দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে

৪. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশসমূহের বিদ্যমান শর্তের সাথে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করতে হবে

৫. করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার ও মালিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে

৬. লে-অফকৃত কারখানায় একবছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৭. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে

৮. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে

৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন, ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।